গ. মৃত্যুচেতনা

শব্দটি কায়ায় নয়, ছায়ায় আসে আর তাতে পুরন দাজুর নেপালি পানশালাগুলোতে ঘুম উড়লছুট ঘুড়ির মতোই লটকে যায়। অতঃপর চোখের হিরেয় কোন প্রতিসরণের গণিত খেলেছে— সে কারওরই জানা হয়ে ওঠে না। মেয়ারের "Is there anybody there" রণন পরাঙ্মুখ নালিঘাসে ডুবোতল হলে মনে হবে যে অবনী এ বাড়িতে ফেরে না কখনও, বা এখানে অবনীরা থাকতে পারে না কিংবা অবনী বলে কেউ আসলেই নেই— মৃত্যু। এর শব্দার্থ তাই শব্দবোধ, গল্পশোধ অব্যর্থ তার। সকল অনুচ্ছেদের শেষ পূর্ণচ্ছেদ সবশেষের পূর্ণঘট ভাঙে।...

এহেন লৌকিক মরণই অ-লৌকিক কবিতার চরণে রসনিষ্পত্তি নেবে, ঠিকানা পাবে সুখের মতো ব্যথারা। মৃত্যুবিষুবেও এমিলি ডিকিন্‌সন বা রবীন্দ্র-বেদনগান তাই পালক। এম্নিতে, প্রেম ও বিরহ, মিলন ও বিচ্ছেদ সহোদরস্থানীয়। অবস্থানে এরা এত গা-লাগা যে মধ্যে-মধ্যে ভ্রান্তি জাগে। পদাবলির প্রেমবৈচিত্ত্যের পদ নচেৎ গ্রথিত হয় না। আবার বিখ্যাত শেলিকে এ প্রসঙ্গেই মনে পড়বে— কারুণ্য কীভাবে সবুজ হয়, হিমায়িত হৃদয় এঁকে ফেলে মধুর সংগীত।... কিন্তু, নির্মেদ মৃত্যু কবিতাদেশে নগ্ন নেমে এলে মনে গ্রহণ লাগে। কবিতাকার কবিতামোদে সংক্রমণ ছড়ান। ঘর ও পার উজাড় তখন উজাগর রোহিণী তারায়।...

বোধ সর্বতো নৈর্ব্যক্তিক নয়। মৃত্যুচিন্তনও সেখানে আলাদা-আলাদা। স্থানিক জলবায়ু বা জাতি-সম্প্রদায়গত প্রভেদও ফারাক মানে বই কী! কবিসত্তার নির্মিতিতে এই ভূমিকাগুলির এককথার ভূমি রয়েছে। কবির মর্মচোখে দেখা কবিতাপ্রাণেরা চর্মচোখে দেখেন। কবির ভাবনার বিশিষ্টতা তাঁর কলমের শিষ্টতায় খেলে; এক প্রমিত নিবিষ্টতা অনুভবী মনোলোক জারিয়ে দেয়।...

অবশ্য মৃতাক্ষর ভিন্ন হলে জীবন ও সময় সংক্রান্ত চেতনারও যে রকমফের হবে বলাই বাহুল্য। পূর্ব-পশ্চিম এই নিরিখেও যেন সরে সরে গেছে। ওখানে সময়কল রৈখিক (Linear), এখানে বৃত্তীয় (Spirally circular)। ওখানে জীবনের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর কিছু নেই আর এখানে জীবনের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর জীবন ফের। লোকায়ত ও লোকোত্তর এখানে সমাবর্তনসূত্রে বাঁধা। হয়তো সেজন্যই উপমহাদেশের মাটিতে সে-অর্থে গভীর ট্রাজেডিযাপন সম্ভবপর হয়নি। বাংলার প্রেমের গানলেখককে লোকান্তরতরণীর নেয়ে পর্যন্ত হওয়ার কথা ভাবতে হয়েছে। ভারতীয়তায় কলঘড়ি ঠিক কেমন, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কালজয়ী একটি রচনার নির্বাচিত অংশে তার স্বাক্ষর মিলবে— "...হিন্দুকুশ পর্বতের শিখরে হীরে-জহরতে মোড়া এক রাজা শরীর চিতার উপরে তুলে দিয়ে এক সন্ন্যাসিনী বললেন— 'সখী, তোরা সেই গান গা।'

চারদিকে চার সন্ন্যাসী ঘিরে ঘিরে গাইতে লাগল— 'আজ কি আনন্দ।'

"সন্ন্যাসিনী সেই শোলাঙ্কি রাজকুমারী; আর সেই রাজদেহ বাপ্পার মৃতদেহ— দু'জনে চিরদিন দু'জনের সন্ধানে ফিরেছিলেন, কিন্তু ইহলোকে মিলন হয়নি।"[১] এখন, ইহলোকের কথা উঠলে সেই মুহূর্তে তারই সঙ্গে পরলোক নামক কোনও অন্যথার সম্ভাবনা আচ্ছন্ন পাঠকমনে স্বপ্ন পায়। "কিন্তু মিলন হয়নি" বললেও বাক্যটি সম্পূর্ণ হতো, সনাতন দেশীয় কাঠামো সেই দাবি করে না। তবু, ক্রমায়ত জটিল হতে থাকা আধুনিকতর জীবিকাযাত্রায় নীলমৃত্যু জীবনের দক্ষিণে ঘর করে, এবং সহৃদয়সামাজিক কবিও বড় একটা অন্তরালবাসী নন। জীবন ও মৃত্যু সমান্তরসজ্জায় দ্বিধান্বিত কবির কাব্যভুবনে লাগু হয়ে পড়ে।

প্রাক্-রবীন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও তৎপরবর্তী বাংলা সাহিত্যিক অনেকেরই মন ও মননের পত্রমূলে মৃত্যুশীত ছুঁয়েছেনে আছে। রবীন্দ্রনাথ বা বিভূতিভূষণ, জীবনমরণের নিঃসীমে ঈশ্বর যাঁদের কাছে পান্থজনের সখা, মৃত্যুতে ঋদ্ধির মহিমা জেনেছেন। জীবনানন্দ দাশের ভুবনে তা সংঘটনের স্বয়ংক্রিয় চাবি— "কখন মরণ আসে কে বা জানে— কালীদহে কখন যে ঝড়/ কমলের নাল ভাঙে— ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ/ জানি নাকো;..."[২] জলামাঠ ছেড়ে বুনোহাঁসেরা যখন চাঁদের আহ্বানে আদৃত হয়, তখনই চাঁদ আর চিতাকাঠের দ্বন্দ্বসমাস কবি শক্তিকে (কবিশক্তিকে?) জেরবার করে ছাড়ে। মৃত্যুর তন্নিষ্ঠ রূপকার অন্যধারার লিখিয়ে সুবীর মণ্ডলও। "জীবন এবং মৃত্যুর মাঝখানে শাদা একটা কাপড়। অসম্ভব নির্লিপ্তিই তাঁর হাওয়া থাক, না থাক, কাপড়টা দুলতে থাকে।..."[৩] জাতীয় উচ্চারণের শক্তিশেল।

এই নিবন্ধে আমরা বিনয় মজুমদারের কবিতায় নিহিত মৃত্যুভাবনা নিয়ে আলাপচার করবো। মানবীয় প্রেমের আখ্যান তিনি যে মানবীকে স্মরণ করে নির্মাণ করছেন, তার নাম 'ঈশ্বরী'। এই স্ববিরোধ জন্ম দিচ্ছে বিশ শতকের রূপান্তরিত পদাবলির। অবশ্য, অপেক্ষা ও অপেক্ষকের বনিয়াদ এখানে বদলে গেছে, এই যা! কিন্তু, বিচ্ছেদ অর্থে মৃত্যুর ছায়াপুতুল বিনয়ের কবিতার ছত্রে কখনওই সেভাবে ঘোরাফেরা করেনি। জীবনানন্দ দাশ বা পরের শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তুষার রায়, কিংবা আরও পরের সুবীর মণ্ডলের কবিতায় যেমন আমরা মৃত্যু নামক অশরীরীর সুলুকসাক্ষাৎ পাই, বিনয়ের সর্বাধিক আলোচিত কবিতায় তা নেই। বরঞ্চ, মৃত্যুর তিন বছর আগে প্রকাশিত (২০০৩ খ্রিঃ) ও সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কার (২০০৫ খ্রিঃ)-প্রাপ্ত 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' নামের কবিতার বইটিতে বিনয়ের আনুষ্ঠানিক মৃত্যুচিন্তা প্রত্যক্ষ করার মতো, বইটির 'আমার বাবা যখন', 'মায়ের' ও 'ভেবে যাই' শীর্ষক কবিতা যার পরিচায়ক। এছাড়া, তাঁর অপ্রধান ও অখ্যাত কিছু কাব্যগ্রন্থের কয়েকটি কবিতায় মৃত্যুচিন্তার বীজধান পাবো।

বিনয় শিশু বিনয়ের বর্মাবাসকালের স্মৃতি একদা রোমন্থন করেছিলেন, প্রদীপ মণ্ডল অনুলিখিত বিনয় মজুমদারের 'আমার ছোটবেলার কথা' লেখাটিতে তাঁর মনোভূম গঠনের ইঙ্গিত মেলে। নির্বাচিত অংশ : "...ঐ শহরে অনেক বাঙালী পরিবার ছিল। একটা লোক ছিল গরু কাটবার কাজ করত সে, গরু কেটে কেটে মাংস বিক্রি করত। এই লোকটির যখন মরবার সময় উপস্থিত হলো তখন মরবার আগে গরুর মত হাম্বা হাম্বা করে ডাকছিল।..."[৪] "মা কুরু ধনজনযৌবন গর্বং।/ হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্বম্।।"— শঙ্করাচার্যের প্রবাদতুল্য পদটির যে মর্মার্থ শিশুবিনয় বর্মানিবাসী বাঙালি কসাই মানুষটির জীবন ও জীবনীর ভিতর প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাকেই মূল থিম (theme) করে তাঁর 'হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ' কাব্যগ্রন্থের 'মায়ের' কবিতাটি আকার পেয়েছে বলে মনে করা চলে।

"মায়ের ইসোফেগাসে ক্যানসার হয়েছিল, ফলে

কোনো কিছু গিলে খেতে পারত না, জল

খেতে পারত না।

পীযূষ ডাক্তার

গ্লুকোজ ইনজেকশন দিত দুই হাতে।

তাতে আর কী বা হয়, না খেয়ে পনেরো দিন থেকে

মাও মারা গেল ।

মরবার আগে একবার

আমার বাবাকে মা তো কুকুর বলেছে।

মরবার আগে মা আমার

বাড়ির চাকরটির পা-ও ধরেছিল।

এর নাম মৃত্যু, মহাশয়।"[৫]

এদিকে, পুনর্জন্মের প্রশ্নে কবিসত্তা ত্রিধাবিভক্ত। কখনও তিনি সচেতন প্রতীচ্যবাদী (ছাত্রাবস্থাতেই যে মার্ক্সীয় বীক্ষার নৈকট্যে এসেছিলেন, মনে রাখতে হবে), কখনও বা সুচারু কূটনৈতিক, কখনও বা প্রচেষ্ট প্রাচ্যাদর্শী। 'যখন আমার বাবা' কবিতাটিতে তিনি

জন্মান্তরবাদকে নস্যাৎ করেন।

"যখন আমার বাবা খুব বুড়ো হয়েছিল
বয়স তিরানব্বই বৎসর হয়েছিল তখন তো বাবা
বিছানায় বসতেই পারত না, শুয়েই থাকত।
বুড়ো হলে এই হয়, আমারো তো হবে।
বড় ভগ্নীপতি এসে হাবড়ায় নিয়ে
বাবার পেটটি কেটে এনেছিল, পরে
একটানা এগারোটি দিন ব্যাপী রক্ত পড়েছিল
কাটা পেট থেকে।
বাবার তো আত্মা নেই, পুনর্জন্ম নেই।
বাবাকে পোড়ালে পরে বাবার ছাই তো আছে, এই
ছাই ভাবে পৃথিবীর মাটির সহিত।"[৬]

পরক্ষণেই আবার আত্মলীন পেণ্ডুলামে দুলে ওঠেন। শুধু যাওয়া-আসা, শুধু স্রোতে ভাসার নিরন্ত পথের পাঁচালি বুঝে নিয়ে পরজীবনের অস্তিত্ব, অনস্তিত্ব বুঝতে পারেন না।

"সব কিছু ঠিক চলে মৃত্যু আছে ব'লে
মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে চলেছি সকলে
যার যার সৎ পথে মিথ্যা প্রবঞ্চনা
অতি কম তবু আছে, কেউ থাকব না।
মৃত্যু হ'লে পরজন্ম আছে কিংবা নেই
জানিনা আমরা কেউ, তবে সকলেই
জানি, মৃত্যু আছে ফলে জমি চষে লোকে

মৃত্যু আছে ব'লে সবে বিদ্যালয়ে ঢোকে

লেখাপড়া শেখে লোকে মৃত্যু আছে ব'লে

ট্রেনগুলি বানিয়েছি এবং সকলে

ট্রামগাড়ি চড়ে আর অফিসেও যায়।

উত্তেজিত হয়ে যেই সবার মাথায়

খুন চাপে সে সময়ে মৃত্যুচিন্তা আসে

সব মর্মরিত হয় মৃত্যুর বাতাসে।"[৭]

অতঃপর অনেকটা মধুকবির বঙ্গভূমির প্রতি টান-ভালোবাসা জাগার মতো করেই বিনয়ের মৃত্যুচেতনা পরিবর্তিত। পূর্ব-দর্শন তাঁর অপূর্ব মনে হয়। লিখছেন—

"...আমি ভালো আছি বলে আমার নিজের বাগানের

ফুলগুলি ভালো আছে এবং আমার এই বাগানে রয়েছে বলে আমি

নিজে বেশ ভালো আছি ফলে বুঝি যাই হোক আমার জীবনে—

আমি শেষে বায়ু হয়ে ভস্ম হয়ে গেলেও নিশ্চিত

বায়ু আমি ভস্ম আমি চিরকাল রয়ে যাব এ বিশ্বে, আকাশে।"[৮]

বিনয় পুনর্জন্ম বিষয়ক হৃদয়সংবাদটি বিনয় অতলদহে অনুধাবন করেন। ফেরজীবনের প্রতীতি কমিউনিস্ট বিনয়ের কবিতাছত্রে জমাট হয়! এ কথা কম গুরুত্বের নয়।

"ভবিষ্যতে কী কী হবে— এ চিন্তা আসল।

আমরা মৃত্যুর পরে বেঁচে থাকব কি

ভূত হয়ে, তাই সই বলো সখা-সখি।

এতো তো নিশ্চিতি নেই, মৃত্যুর পরেও

বেঁচে থাকবই এই আশা করা শ্রেয়

জোর করে কষ্ট করে এই ভেবে যাই

আমরা পৃথিবীময়, আহ্বান জানাই

পৃথিবীর সকলকে, আমাদের এই

জোর করে ভাবা ছাড়া অন্য পথ নেই

ভবিষ্যৎ জানবার, যদি ভেবে যেতে

সকলে পারি তো পারি পুনর্জন্ম পেতে।”[৯]

একটি কবিতায় নশ্বর প্রাণতা, অনশ্বর আত্মা ও সনাতন চলসময়ের নিত্যতার ‘এইকথাটি’ লঘুস্বর বিনয়ের সঙ্গেই বিনয় মনে রাখতে চান।

“সকলে পাগল হয়ে যেতো এই ধরালয়ে

যদি তারা ভাবত যে ম’রে

গেলেই সকল শেষ পরানের কোনো লেশ

থাকবে না ম’রে গেলে পরে।

আমি ধরণীর ধূলি এই বলি খোলাখুলি

আর যদি এই ধরণীকে

ধরণীর কোনোটাকে কেউ না বানিয়ে থাকে

এমনিতে হয়ে আছে টিকে

তবে হয় ভালো আরো বিনাশ নেই তো কারো

ধরণীকে যারা ভ’রে আছি

তারা সব সুগোপনে একটি সমীকরণে

রয়ে তবে ধরণীতে বাঁচি।

ভাবি তার মানে হলো সকলে থাকবে বলো

যা ঘটুক রয়ে যাবে ঠিক।

আগুনে পুড়েই ছাই হবে ওই দেহটাই

মরে গেলে বুঝেছো, পথিক।”[১০]

আজীবন কবিতার জন্য একান্ত গণিত লিখতে চেয়েছিলেন বিনয়। নিদেনপক্ষে তাঁর তিনটি কবিতা ভাবে ও গঠনে গণিতলক্ষণাক্রান্ত— যুক্তি, তক্কো, প্রমাণে খানিক দার্শনিক উপপাদ্যের চেহারা নিয়েছে।

“একটা লোক মরে গেছে, মাথাটা পুবদিকে, চিত হয়ে শোয়া
পা পশ্চিম দিকে। এই মরা মানুষটির উত্তরে দাঁড়িয়ে
মরা মানুষটিকে দেখছে ভগবান। এর পরে মরা মানুষটির
পায়ের দিকে তাকিয়ে ভগবান মনে মনে ভাবলেন, পায়ের পাতার
পশ্চিমপাশে লেখা হল “আই টু দি পাওয়ার মাইনস ওয়ান”।
সঙ্গে সঙ্গে মরা মানুষটি দাঁড়িয়ে পড়ল। ঘড়ির কাঁটা যেদিকে ঘোরে
সে দিকে ঘুরে গেল এবং দাঁড়াল, দাঁড়ানো অবস্থায় সদ্য জীবিত মানুষটি
তাকিয়ে রইল পশ্চিমদিকে। তারপরে হেঁটে চলল পশ্চিমদিকে।
এইভাবে মরা মানুষকে বাঁচানো যায়।”[১১]

কিংবা :

“মৃতদেহ পোড়ানোর সময়ে মৃতের বায়বীয়
অংশটুকু নিকটের লোকদের নাসিকায় ঢুকে যায়
এ ব্যাপারে মনোযোগ দিও।
এবং তা বায়ু নয় মৃতের বাষ্পই স্মরণীয়
এ বায়ু জীবিত আর পুরুষের নাকেঢুকে সে তো
ফুসফুসে রক্তে মেশে, মেশা অভিপ্রেত।
এই যে বায়ুটা ঢোকে

নিঃশ্বাস নেয় লোকে

কারণ এ বায়ু নয়

দাহ্যমান শরীরের বাষ্প হয়

সুতরাং এই রক্তে ঢুকে

পুনর্জন্ম হয়ে যায়, নরনারী হয়ে যায় প্রিয়।"[১২]

কিংবা :

"মৃত্যু যখন রয়েছে তখন পুনর্মৃত্যু আছে।

একবার যদি কিছু ঘটে তবে সন্দেহ থাকে পাছে

এই কিছু মোটে ঘটেই নি— ব'লে

প্রমান [প্রমাণ] রয়েছে, একবার হলে।

তিনবার সেই কিছু যদি তবে ঠিক ঘটিয়াছে।

ফলে শবদেহ একবার করে নিশ্চিত নই শব

আদৌ পোড়ানো হল কি হল না— হিয়ার গোপন রব।

নিশ্চিত হতে যদি তিনবার

দাহ করি তবে তার তো আবার

আরো তিনবার জন্ম হবার বাধ্যতা রহিয়াছে।"[১৩]

কোথাও কোথাও তাঁর আরোপিত মৃত্যুবিষয়ক তত্ত্ব বেদিশা হয়ে কবিতাকে নষ্ট করেছে। পাঠান্তে কিছুই প্রায় মেলেনি।

"দু'টি মৃত্যুর মাঝামাঝি

বসে আছি আমি এক কবি

আমার গায়ের পরে একটি রক্তিম বর্ণ

চাদর রয়েছে।

দু'টি মৃত্যুর মানে

যদি সরাসরি মৃত্যু হয়

তবে আমি কিন্তু দেখছি যে

আমি বেশ জীবিত অবস্থায়—

দুইটি চাদর ঢাকা মৃতদেহ দেখে যাচ্ছি ঠিক,

আমি কিন্তু বসে আছি জীবিত অবস্থায়

মুখে মুখে কবিতা বলছি

...''[১৪]

কবিতার এই বয়ন পাঠককে কোথাও পৌঁছে দেয় না। দুর্বোধ্য হেঁয়ালির মতো শব্দচয়ন ও চিত্রকল্পের দৌর্বল্যে কবিতা ও কবিত্ব চ্যাপ্টা হয়ে গিয়েছে। তবে একটি কবিতায় তিনি একই ফ্রেমে মৃত্যুকে জীবনের গান শোনাতে পেরেছেন। কবিতাশুরুর ''একলা একটি ঘরে আছি/ আমি বহুদিন হল/ মরলে তোমরা বলো।/ মনে হয় মরলেই বাঁচি।...'' চরণ কবিতাশেষের ...তাহলেও মরণকে ভয়/ সকলেই করি আর/ সাধ নেই মরবার/ বাঁচতেই চাই অতিশয়।''[১৫] চরণে উপনীত (উন্নীত?) হয়েছে। এছাড়া মৃত্যুর বছরে লেখা অন্য একটি কবিতায় বিনয়ের স্বপ্নদেশ ঘিরে ফেলে চিতার আগুন, বাবা-মা'র প্রয়াণ ও অন্তেষ্টি চোখের সামনে ভেসে ওঠে; মনে হয় চিতাকাঠ 'আয় আয়' ডাকে, তাঁকে—

'''মানুষের মৃত্যু হলে মানুষ যেখানে থাকে তার নাম পরলোক'—

এই কথা আমি মনে রেখেছি তো ভুলিনি এখনো।

মা বাবাকে পুড়িয়েছি আমি নিজে চিতা জ্বেলে অনুপম ও বিজিত

দরকারমতো কাঠ দিয়ে দিয়ে পোড়ালো তো; আমি

চিতার নিকটে নয়, খালি পায় চিতা থেকে কিছু দূরে দাঁড়িয়েই

দেখলাম পোড়াবার দৃশ্য, স্বপ্নে দেখেছি মা এবং বাবাকে।''[১৬]

কিন্তু, ‘গায়ত্রীকে’-পর্বেই তড়বড়ে-যুবক বিনয়ের মধ্যে একধরনের মৃত্যুত্ব রসায়িত হয়েছিলো। ‘গায়ত্রীকে’-র পাণ্ডুলিপি থেকে তিনটি কবিতা ‘গায়ত্রীকে’ বইটিতে বর্জিত হয়েছিলো। পরে সেগুলি তাঁর ‘আমাকেও মনে রেখো’ (অতএব প্রকাশনী, প্র.প্র.কা. ২৫ ডিসেম্বর, ১৯৯৫ খ্রিঃ) নামক কবিতার বইয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়। তার মধ্যে একটি কবিতায় বিনয়কে মরলোকের অপ্রাপ্তিগুলি পরলোকে মিটিয়ে নিতে দেখেছি। কবিতার শুরু ও শেষ সেই অশেষে, যেখানে জীবনচিহ্ন যায় না, যা আছে বা নেই কোনওটাই বোধহয় খুব কর্তৃত্ব নিয়ে বলা চলে না—

“নিশ্চিত মরেছি আমি, মর্ত্যের জীবন শেষ হলো;
মর্ত্যের শরীর ছেড়ে সরাসরি, স্বর্গলোকে আমি।
আমাদের বাসস্থান স্বর্গলোক, আমাদের মানে
কেবল দুইটি আত্মা—স্বপ্না আর আমি—এ-দুজন
ঈশ্বরী ও ঈশ্বরের বাসস্থান স্বর্গলোক। দেখি,
আগেকার পরিচিত—মর্ত্যের যুবতী দেহ নিয়ে
অভ্যর্থনাময় হাসি ওষ্ঠে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে
আমার ঈশ্বরী, আর আমিও বাসনা অনুসারে
স্বর্গেও শরীর পাইপ—স্বাস্থ্য ঠিক স্বপ্নার মতোন,
উচ্চতা স্বপ্নারই মতো, দৃষ্টিশক্তি স্বাভাবিক ব’লে
চোখে আর চশমা নেই—ওর প্রিয় সুন্দর যুবক।
মৃদু হেসে ব’লে ওঠে—এতদিনে কাজ সেরে এলে,
আমরা এখন সব শান্তি-তৃপ্তি-রোমাঞ্চের সুখ
গভীর, অপরিমেয় পরিমাণে দেহমনে পাবো,
আমাদের অভিলাষ অনুসারে সব—সব কিছু
হয়ে যায় ব’লে; এসো/ অতঃপর গাঢ় আলিঙ্গনে

প্রগাঢ় চুম্বন ক'রে সম্মিলিত দাম্পত্যজীবন

অনন্তকালের জন্য যাপন করার প্রতিশ্রুতি

দিয়ে ছিলো, শুরু হলো প্রণয়সম্পৃক্ত আত্মাদের

স্বর্গস্থ জীবনলীলা—অনন্তকালের জন্য লীলা"[১৭]

'মানসী' অর্থে 'স্বপ্না' শব্দটির চয়ন বিনয় আর কোথাও করেননি। ঠিক এর আগের বর্জিত কবিতাটিতেই[১৮] বিনয় তাঁর স্বপ্নের ঈশ্বরীকে লোকান্তরলোকে একা হৃষ্ট-শুভ্র প্রতীক্ষায় রেখেছেন, বিনয়ের সমগ্র এই দৃশ্য-পরিকল্পনাটির সঙ্গেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দেবযান'[১৯] উপন্যাসকাহিনির ভাবসাদৃশ্য খোঁজা যাবে। যেখানে, কুড়ুলে-বিনোদপুর গাঁয়ের যতীন ও পুষ্প-র এ-জন্মে পরিণতি না-পাওয়া প্রণয়টি অন্যলোকে আলোকসঞ্চারী ছিলো।

তথ্যসূত্র :

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর; 'বাপ্পাদিত্য'; রাজ কাহিনী, ছোটদের অমনিবাস; (সম্পা.) লীলা মজুমদার; এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানি; ষষ্ঠ মুদ্রণ : মাঘ ১২, ১৪১১/ জানুয়ারি ২৬, ২০০৫; কলকাতা-সাত, পৃ. ৩০০

২. জীবনানন্দ দাশ; ১৯ সংখ্যক কবিতা (প্রবেশক কবিতাটি বাদে); রূপসী বাংলা; সিগনেট প্রেস; একাদশ সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৮৫; (প্র. সত্যজিৎ রায়), কলকাতা ২৩; পৃ. ২৯

৩. সুবীর মণ্ডল; ৪ সংখ্যক কবিতা (বিভাব কবিতাটি বাদে); লাইফ লাইন; নির্বাচিত কবিতা; অভিযান পাবলিশার্স; প্রথম প্রকাশ : ৩০ আগস্ট ২০১২; বনমালীপুর বারাসাত কলকাতা; পৃ. ১১৯

৪. বিনয় মজুমদার; 'আমার ছোটবেলার কথা'; (অনুলিখন) প্রদীপ মণ্ডল; অধরা মাধুরী; (সম্পা.) বোধিসত্ত্ব রায়; ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৯৯৮; ঘোষপুর-মছলন্দপুর, উত্তর ২৪ পরগনা থেকে প্রকাশিত; পৃ. ৪

৫. ঐ; 'মায়ের'; হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১০, মে ২০০৩; কলকাতা-৭০০০২৩; পৃ. ১৫

৬. ঐ; 'যখন আমার বাবা'; ঐ; পৃ. ১৪

৭. ঐ; 'মৃত্যু আছে ব'লে'; বিনোদিনী কুঠী; অফবিট, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৬; কলকাতা-৭০০ ০০৯; পৃ. ২৮

৮. ঐ; 'বায়ু আমি ভস্ম আমি'; ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা/ জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; পৃ. ৯৬

৯. ঐ, 'ভেবে যাই'; হাসপাতালে লেখা কবিতাগুচ্ছ; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৪১০, মে ২০০৩; কলকাতা-৭০০০২৩; পৃ. ৫৩

১০. ঐ, 'অতি পুরাতন কথা', (কা.গ্র. এখন দ্বিতীয় শৈশবে); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৭৪-১৭৫

আরেকটি কবিতায় সময়ের উড়োছুটকে কী আশ্চর্য অংকে ফেলে কবি মাপছেন। কবিতার অঙ্কশয়নের ঊর্ধ্বে কবিতা ও অংকের সংশ্লেষের এই নিরিখে বিনয়ের তুল্যমূল্য বাংলা সাহিত্যে দ্বিতীয় কেউ নেই। নিদর্শন :

"সময় দৈর্ঘ্যই, দৈর্ঘ্য ওজন, ওজন সময়— এটা ছাপা আছে

বহুকাল আগে।

এ দৃষ্টিতে দেখা গেলে— সময় দৈর্ঘ্যই—

— ফলে দৈর্ঘ্য র'য়ে গেলে

সময় তো ব'য়ে যায় দৈর্ঘ্য রূপে— এই ভাবে সমস্যাটি এখনও ভাবছি।"

(অংশবিশেষ)

দ্র. ঐ, ‘আজকে ফাল্গুন শেষ’, বিনোদিনী কুঠী, অফবিট, প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০০৬, কলকাতা ৭০০ ০০৯, পৃ. ২৯

১১. ঐ; ‘মরা মানুষ বাঁচানো’; ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা/ জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; পৃ. ৬৫

১২. ঐ; ‘পুনর্জন্ম’; একা একা কথা বলি; নৌকো প্রকাশনী; প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৪১২, জানুয়ারি ২০০৬; আদর্শপল্লী বিরাটী কলকাতা-৫১, পৃ. ৬২

১৩. ঐ, ‘মৃত্যু’, ঐ, পৃ. ৬১

১৪. ঐ; ১ সংখ্যক কবিতা, তিনটি কবিতা; ২; ছোটো ছোটো গদ্য ও পদ্য; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা/ জানুয়ারি ২০০৭, মাঘ ১৪১৩; কলকাতা-৭০০০২৩; পৃ. ৬৯

১৫. ঐ; ‘একলা একটি ঘরে’; ১; ঐ; পৃ. ৪২

১৬. ঐ; ‘একটি নারীকে আমি’; পৃথিবীর মানচিত্র; কবিতীর্থ; প্রথম প্রকাশ : কলকাতা বইমেলা জানুয়ারি ২০০৬, মাঘ ১৪১২; কলকাতা-২৩; পৃ. ৫৫

১৭. ঐ; ‘‘গায়ত্রীকে’র পাণ্ডুলিপি থেকে’ (৩); (কা.গ্র. ‘আমাকেও মনে রেখো’); কাব্যসমগ্র (দ্বিতীয় খণ্ড); (সম্পা.) শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রতিভাস; প্রথম প্রকাশ : ১লা বৈশাখ ১৪০৯, এপ্রিল ২০০২; কলকাতা-২; পৃ. ১৫২

১৮. ঐ, ‘‘গায়ত্রীকে’র পাণ্ডুলিপি থেকে’ (২), ঐ

১৯. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘দেবযান’, মিত্র ও ঘোষ, ঊনবিংশ মুদ্রণ : ফাল্গুন ১৪১০, কলকাতা ৭০০ ০৭৩